জমীদার দর্পণ : বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্য

বিশ্বজিৎ ঘোষ*

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯১১) চল্লিশ বছরের সাহিত্য সাধনার উজ্জ্বল কীর্তি *জমীদার দর্পণ* (১৮৭৩) নাটক। একশ' সাতাশ বছর পূর্বে প্রকাশিত এই নাটকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের জমিদারি ব্যবস্থার অভিশাপ ও অনাচার শব্দবন্দী হয়ে আছে। বস্তুত সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য কিংবা নান্দনিক উৎকর্ষ নয়, বরং সমাজচিত্রের বস্তুনিষ্ঠ রূপায়ণের কারণেই *জমীদার দর্পণ* আজও বাংলাভাষী পাঠকের কাছে এক অনুপম গ্রন্থ রূপে আদৃত। জমিদারি ব্যবস্থার কুফল, শাসক-শোষিত সম্পর্কের হৃদয়হীনতা, সাধারণ প্রজার উপর জমিদারদের নির্মম নিষ্পেষণ, জমিদার-রাক্ষসের কাছে নারীর চরম লাঞ্ছনা—এইসব বিষয় নিয়েই গড়ে উঠেছে জমিদার দর্পণ নাটক। সুদূর ১৮৭৩ থেকে এ-যাবৎ নানা মাত্রায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে *জমীদার দর্পণ* নাটক বিবেচিত হয়েছে—কখনো এর জনয়িতা প্রশংসায় নন্দিত হয়েছেন, কখনো-বা হয়েছেন নিন্দিত। জমিদারশ্রেণীর শোষণ আর জমিদারি ব্যবস্থার কুফল দেখানোই ছিল মীর মশাররফ হোসেনের মৌল অন্বিষ্ট। তাই নাটকের প্রারম্ভেই তিনি নিবেদন করেছেন

> নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমিদার বংশে আমার জন্ম, আত্মীয়-স্বজন সকলেই জমিদার, সুতরাং জমিদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় জমিদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি।[১]

---

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১. মীর মশাররফ হোসেন, *জমীদার দর্পণ* (সম্পাদক : আশরাফ সিদ্দিকী), ঢাকা : ওয়ার্সী বুক সেন্টার, ১৯৫৬। বর্তমান প্রবন্ধে *জমীদার দর্পণ* নাটকের উদ্ধৃতিসমূহ আশরাফ সিদ্দিকী-সম্পাদিত উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে।

স্পষ্টতই বোঝা যায়, জমিদারি ব্যবস্থার বহুমাত্রিক রূপ অঙ্কনই ছিল মশাররফ হোসেনের মৌল উদ্দেশ্য। তবে, আলোচ্য নাটকে আমরা জমিদারি ব্যবস্থার সামূহিক কোন রূপ নয়, বরং জমিদারের বিকৃত কামুক প্রবৃত্তি এবং বিচারের নামে প্রহসনের ছবিই দেখতে পাই। নাটকের 'প্রস্তাবনা'-য় সূত্রধারের সংলাপে এবং নট-নটীর সঙ্গীতে জমিদারি ব্যবস্থার সামূহিক অনাচার উপস্থাপনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন নাট্যকার। যেমন-

সূত্রধার হা ধর্ম! তোমার ধর্ম লুকালো ভারতে ;
জমিদার অত্যাচারে ডুবিল কলঙ্কে!

[প্রস্তাবনা]

কিংবা নট-নটীর দ্বৈতসঙ্গীতে -

মরি দুর্বল প্রজার পরে অত্যাচার।
কত জনে করে, করে জমীদার॥
তারা জানে মনে, জমীদার বিনে
নাহি অন্য কেহ দুঃখ শুনিবার।
প্রজা কত সহে কিছু নাহি কহে
মনে ভাবে এর নাহি উপায় আর॥
জমীদার ধ'রে জরিমানা করে
মনোসাধ পুরে, নাশিছে প্রজার
শুন সভ্যজন, করিয়ে মনন
দেখাইব আজি অভিনয় তার॥

[প্রস্তাবনা]

— উদ্ধৃতিদ্বয় থেকে মশাররফ হোসেনের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। জমিদার দর্পণ প্রকৃত অর্থেই শতবর্ষ পূর্বে বাংলাদেশের জমিদারশ্রেণীর অত্যাচার, নির্যাতন আর হৃদয়হীনতার ঐতিহাসিক দর্পণ, বিশ্বস্ত দলিল।

জমীদার দর্পণ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে সোমপ্রকাশ পত্রিকাও নাট্য-কাহিনীর সত্যতার প্রতি পরোক্ষ আভাস দিয়েছে -

> যাঁহারা কলিকাতা অথবা তাহার সন্নিকটে বাস করেন তাঁহারা মনে করিতে পারেন গল্পটি অত্যুক্তি দোষে দূষিত। কিন্তু আমরা তাহা মনে করিনা, আমরা দূর মফস্বলস্থ কোন কোন জমীদারের চরিত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি, তাঁহাতে কোন রূপেই আমাদিগের এরূপ বোধ হইতেছে না যে গল্পটাতে অত্যুক্তি দোষের গন্ধ আছে। গ্রন্থকার ... দূর মফস্বলে বাস করিয়া থাকেন, অতএব মফস্বলের জমীদারেরা যে সকল কাণ্ড করেন তাহা তাঁহার অবিদিত নয়, হয়ত এরূপ ঘটনা হইয়াছে, তাহার অন্যতম জাতি যে অত্যাচার করিয়াছেন, তিনি স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, গল্পটির সামান্যভাবই তাহার রূঢ় বর্ণনায় যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। আমাদিগের স্পষ্ট বোধ হইতেছে, গ্রন্থকারের যদি কিছু মিথ্যা যোগ করিবার ইচ্ছা থাকিত, তিনি নানাপ্রকার অলঙ্কার দিয়া গল্পটিকে সুশোভিত করিয়া তুলিতেন।[২]

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর অপ্রকাশিত আত্মজীবনীতে এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন -

> জমিদার দর্পণ হাতে লিখিয়া আমার বাটিতে কুমারখালিতে কয়েকবার অভিনয় করা হয়। শেষ অভিনয় দিনে আনার মোল্লাকে ['এই মোল্লার স্ত্রীই জমিদারের অত্যাচারে প্রাণ হারাইয়াছিল।'- পাদটিকা] উপস্থিত করিয়া দর্শকগণকে দেখান হইয়াছিল। সত্য ঘটনামূলক নাটক অভিনয় সময় নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ সকলেই জীবিত।[৩]

বাস্তব ঘটনা অবলম্বনে রচিত বলে জমিদার এবং তার অনুগত গোষ্ঠী এই নাটক রচনার জন্য মশাররফ হোসেনের প্রতি প্রবলভাবে রুষ্ট হন। তাই জ্ঞাতিভ্রাতা পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীকে নাটকটি উৎসর্গ করতে গিয়ে এ-প্রসঙ্গে নাট্যকার উৎসর্গ-পত্রে লিখেছেন - "সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। একবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু

---

২. *সোমপ্রকাশ*, ৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৮০/১৯ মে ১৮৯৩, পৃ. ৪২৩-২৪। উদ্ধৃত : আবুল আহসান চৌধুরী, *মীর মশাররফ হোসেন : সাহিত্যকর্ম ও সমাজচিন্তা*, ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৯৬, পৃ. ২৮৭

৩. উদ্ধৃত : আবুল আহসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।" এইসব প্রমাণ এবং অভ্যন্তরে সাক্ষ্য থেকে একথা স্পষ্টতই বলা যায়, *জমীদার দর্পণ* সত্য-ঘটনা অবলম্বনে রচিত উনিশ শতকের একটি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

২.

তিন অঙ্কে বিভক্ত ন'টি দৃশ্য বা গর্ভাঙ্কের সমবায়ে গড়ে উঠেছে *জমীদার দর্পণ* নাটকের অবয়ব। প্রতিটি অঙ্কেই রয়েছে তিনটি করে দৃশ্য। এ-ছাড়াও রয়েছে দু'টি দৃশ্য — সূচনায় 'প্রস্তাবনা' এবং সমাপ্তিতে 'উপসংহার'। অতএব, সে হিসেবে নাটকের মোট দৃশ্যসংখ্যা দাঁড়ায় এগার। আকারে ক্ষুদ্র এই নাটকের কাহিনী সরল, একরৈখিক এবং একমুখী উদ্দেশ্য-তাড়িত। জমিদারি ব্যবস্থার কুফল এবং জমিদারদের লাম্পট্যের স্বরূপ উন্মোচনই লেখকের মৌল উদ্দেশ্য। এরসঙ্গে অনুষঙ্গী বিষয় হিসেবে এসেছে ইংরেজ বিচারকদের প্রহসনমূলক বিচারব্যবস্থার ছবি।

কোশলপুর গ্রামে জমিদার হাওয়ান আলীর বৈঠকখানায় উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য নাটকের পট। তার লাম্পট্য, উচ্ছৃঙ্খলতা আর স্বেচ্ছাচারিতার কথা প্রজাদের কাছে সুবিদিত। পরনারীর প্রতি আসক্তি তার স্বভাবধর্ম, বিকৃত কামনাবাসনা নিবৃত্ত করতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভক্তপ্রসাদের মতো সে যা খুশি তা-ই করতে পারে। গ্রামের নিরীহ দরিদ্র কৃষক আবু মোল্লার যুবতী স্ত্রী নূরন্নাহারের প্রতি লম্পট হায়ওয়ান আলীর দৃষ্টি পড়ে। দূতী কৃষ্ণমণিকা পাঠিয়ে নূরন্নাহারকে রাজি করানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু পতিপ্রাণা নূরন্নাহার জমিদারের কুপ্রস্তাব ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। নূরন্নাহারকে ভোগ করার উদ্দেশ্যে প্রথমে আবু মোল্লাকে বিনা অপরাধে জমিদারের বাড়িতে এনে বন্দী করে রাখা হয়। স্বামীকে মুক্ত করতে চাইলে জমিদারের প্রস্তাবে নূরন্নাহারকে রাজি করানোর চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হলো, তখন পেয়াদারা জোর করে তাকে জমিদারের কাছে নিয়ে আসে। অন্তঃসত্ত্বা নূরন্নাহারের উপর লম্পট হাওয়ান আলীর পাশবিক অত্যাচারের ফলে তার মৃত্যু হয়। আবু মোল্লা জমিদার বাড়িতে বন্দী ছিল বলে নূরন্নাহারের এ নির্মম পরিণতির কথা কিছুই জানতে পারেনি। অবশেষে জমিদারের কবল থেকে আবু যখন মুক্তি পেলো, তখন জমিদার বাড়ির নিকটস্থ এক বাগান থেকে সে আবিষ্কার করে নূরন্নাহারের মৃতদেহ। আবু মোল্লা সুবিচারের প্রার্থনা করে জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা

দায়ের করে। এবার শুরু হলো বিচারের নামে প্রহসন। অবৈধ অর্থ পেয়ে সাক্ষী এবং ময়না তদন্তকারী ডাক্তার মিথ্যা ভাষণ দেয়। অবশেষে ইংরেজ বিচারকের পক্ষপাতিত্বে হায়ওয়ান আলী বেকসুর খালাস পায়। মামলা রুজু করার জন্য আবু মোল্লার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে হায়ওয়ান আলী দলবল নিয়ে ঘর-বাড়ি ভেঙে দিয়ে আবু মোল্লাকে গ্রাম থেকে বিতাড়িত করে। এই কাহিনী নিয়েই গড়ে উঠেছে জমীদার দর্পণ নাটক।

জমীদার দর্পণ নাটকের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য মশাররফ হোসেনের আধুনিক নাট্যভাবনার পরিচয়বাহী। আজ থেকে একশ' সাতাশ বছর আগে রচিত এই নাটকে আমরা আধুনিক নাট্য-প্রকৌশলের অনেক বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস লক্ষ করি। সময় এবং সমাজ-প্রেক্ষাপটের কারণে মশাররফ হোসেনের হাতে অনেক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারেনি। তবু যে-সব সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য এই নাটকের বিশিষ্টতা, তা প্রকাশ করছে মশাররফ হোসেনের স্বকীয় নাট্য-চেতনার পরিচয়।

জমীদার দর্পণ-এর 'প্রস্তাবনা' এবং 'উপসংহার' অংশ এই নাটকের অন্যতম সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য। সংস্কৃত নাট্যরীতি অনুসরণে আলোচ্য নাটকে সূত্রধার ও নট-নটীর সহায়তায় নাটকের বক্তব্য-বিষয় দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। গ্রিক নাটকের কোরাসের মতো তারা ভবিষ্যতে ঘটতে-যাওয়া-ঘটনা দর্শকদের কাছে আভাসিত করেছে। সূত্রধার এবং নট-নটীর সঙ্গীতগুলোও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মূল কাহিনীর প্রবেশক এবং এক দৃশ্যের সঙ্গে অন্য দৃশ্যের ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ-সূত্র হিসেবে এই গানগুলো বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।[৪] নাটকে এরূপ একটি পদবদ্ধ প্রস্তাবনা, একটি শোকোচ্ছ্বাস এবং দশটি গান সংযুক্ত হয়েছে। নাট্য-কাহিনীতে গতি-সঞ্চার এবং দর্শকদের শ্রান্তি-বিমোচনের উৎস হিসেবে এই গানগুলো যেমন ভূমিকা পালন করেছে, তেমনি প্রকাশ করেছে বিশেষ কোন চরিত্রের মনস্তত্ত্ব কিংবা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যেমন প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে নূরন্নাহারকে ভোগ করার জন্য জমিদার ও তার দলবলের ষড়যন্ত্রের সময়, আজানের ধ্বনি শুনে হায়ওয়ান আলী বলে ওঠে - "নামাজের সময় হয়েছে, চল নামাজ পড়ে আসি....।" তার এই ভণ্ডামি ও বক-ধার্মিক স্বভাব নেপথ্য-সঙ্গীতে আভাসিত :

৪. আবুল আহসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬

কুবাসনা যার মনে তার উপাসনা কি?
মনে এক, মুখে শুধু হরি বলে ফল কি?
মধু মাখা বোল মুখে, গরল রয়েছে বুকে,
হেন ছদ্মবেশী তার অধর্ম্মেতে ভয় কি?
সতীর সতীত্ব ধন, হরিবারে করে পণ,
মুখে বিভু-পদে মন, এদের অন্তঃকালে হবে কি?
[প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক]

কিংবা, জমিদারের লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না-পারার ফলে নূরন্নাহারের অন্তর্যন্ত্রণা এবং অসহায়তাবোধ নিম্নোক্ত সঙ্গীতে সুপ্রকাশিত -

আর কে আছে আমার
এ দুঃখ-পাথারে কে বা হবে কর্ণধার?
যে তরিবে এ দুস্তারে, নিজে সে ভাসে পাথারে,
না হেরি সে প্রাণেশ্বরে, ঝুরি অনিবার।
আমারি, আমারি লাগি প্রাণকান্ত দুঃখ ভাগী
বিপক্ষ হোলো বিরাগী, না দেখি নিস্তার।
শুনেছি ভারতেশ্বরী, দুষ্ট জন দণ্ড কারী
তবে মা গো কেন হেরী, হেন অবিচার?
[দ্বিতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক]

সূত্রধার এবং নট-নটীর সংলাপ ও সঙ্গীত দর্শকদের সঙ্গে নাট্য-কাহিনীর প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছে। ব্রেখটের নাটকে আমরা লক্ষ করি, দর্শকও কখনো কখনো হয়ে ওঠে চরিত্র। আধুনিককালের নাট্যসাহিত্যেও এ-প্রবণতা অন্যতম কৌশল হিসেবে গৃহীত। জমীদার দর্পণে এ-বৈশিষ্ট্য পূর্ণরূপে বিকশিত হয়নি, তবে নট-নটী চরিত্রের মাধ্যমে আমরা সে-প্রবণতারই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি আবিষ্কার করতে পারি। এই বৈশিষ্ট্য মীর মশাররফ হোসেনের কালজয়ী নাট্য-প্রতিভার পরিচয়-নির্দেশক। 'উপসংহার'-

অংশের সমাপ্তিতে নট-নটীর সঙ্গীত, বস্তুত দর্শকদের দৃষ্টিকোণে, দর্শকদেরই কথা হয়ে উঠে এসেছে -

কবে পোহাইবে ভবে এই দুঃখ বিভাবরী
উপায় না হয় ভেবে নিয়ত ভাবনা করি॥
কবে দেব দিবাকর, বিকাশিয়ে সুখকর
নাশিবে তম ঘোর, ঘোর অন্ধকার হরি?
ওহে বিপদ বারণ কর বিপদে তারণ,
তম কর নিবারণ নিবেদন করি ;-
তুমি দেব সর্বময় কাতরে করুণাময়
নাশ কর দীন ভয়, শ্রীপদ কমলে ধরি॥
(উপসংহার)

জমীদার দর্পণ নাটকে ঘটনাসংস্থানে দ্রুততা ও আকস্মিকতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঘটনাসমূহ অতি দ্রুতলয়ে একের পর এক সংঘটিত হয়েছে। ফলে অনেক সময় ঘটনার কার্য-কারণে বিশ্বস্ততা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। দ্রুততা এবং সংক্ষিপ্তির কারণে কাহিনী যথাযথ বিকাশ লাভ করেনি, কখনো বা চরিত্রসমূহ হয়ে পড়েছে খণ্ডিত এবং অর্ধ-বিকশিত। এ-কারণে একটি গোটা মানুষ বা পূর্ণ-বিকশিত কোন চরিত্র জমীদার দর্পণ নাটকে অনুপস্থিত। নাটকের ঘটনাসংস্থাপনে ও নাট্যোৎকণ্ঠা-সৃজনে মনন, যুক্তি এবং বিপরীতধর্মী চরিত্রের সংঘাত উপেক্ষিত থেকেছে, বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে জমিদার হায়ওয়ান আলীর কামজ-বিকৃতি। ফলে এটি হয়ে পড়েছে উদ্দেশ্যমূলক একটি রচনা। প্রহসনের একরৈখিক সংগঠন দ্বারা জমদার দর্পণ প্রবলভাবে প্রভাবিত। তাই এখানে প্রাহসনিক চারিত্র্য সহজেই আবিষ্কার করা যায়। প্রহসনের মতোই এটি একমুখী উদ্দেশ্যের প্রতি প্রবলবেগে ধাবমান, পরিণতিতেও প্রহসনের মতো বিশেষ কোন ব্যক্তির চারিত্র্য-দুর্বলতার নাট্যকথা সৃষ্টি করে সমাপ্ত।

জমীদার দর্পণ নাটকে জমিদার ও প্রজা—এই দুই বিরুদ্ধ শক্তির দ্বন্দ্বে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু প্রহসনের একমুখী ধাবমানতা এবং রিপোর্টিংধর্মী সংলাপের কারণে সে-সম্ভাবনা বিকশিত হতে

পারেনি। *নীলদর্পণের* মতো এখানেও একের পর এক অত্যাচার চিত্র উপস্থাপন করে নাটকটিকে মশাররফ হোসেন মেলোডামার পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। নাটকের কোন চরিত্রের মাঝেই অভ্যন্তর দ্বন্দ্বের উপস্থিতি নেই, অথচ ট্র্যাজেডি নাটকের জন্য তা অনিবার্য সত্য। রায়তের প্রতি জমিদারের অত্যাচারে এখানে শোক এবং করুণা সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু তা মশাররফ হোসেনের শিল্পচেতনার সীমাবদ্ধতার কারণে ট্র্যাজিক মহিমায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। প্রসঙ্গত স্মরণীয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত -

> ... কিন্তু নাটকের ফলশ্রুতিতে ট্রাজেডীর গভীরতা ফুটে উঠতে পারেনি। .. ট্রাজেডীর বিষাদ, নৈর্বেদ-বৈরাগ্য ও নৈরাশ্য, যা মনকে স্তব্ধ বেদনায় অকম্পিত করে রাখে, বাংলা নাটকে তার বিশেষ কোন ত্রুটি-হীন দৃষ্টান্ত নেই। মীর সাহেবের *জমীদার দর্পণ*ও সেদিক থেকে ট্রাজেডী হয়নি, যেমন হয়নি দীনবন্ধুর *নীল-দর্পণ*, গিরিশচন্দ্রের *প্রফুল্ল*।[৫]

ঘটনার দ্রুততা এবং একমুখী উদ্দেশ্যের কারণে জমীদার দর্পণ নাটকের সংগঠন হয়ে পড়েছে দুর্বল, দ্বন্দ্বহীন এবং নক্শাধর্মী। সামাজিক শোষণ ও অবিচার স্রষ্টার নিরাসক্ত শিল্পবোধের অভাবে অখণ্ড ও শাশ্বত কোন মূল্যচেতনার সৃষ্টি করতে পারেনি ; ফলে এর গঠনরীতিতে নক্শাধর্মী রচনার তাৎক্ষণিকতা এবং খণ্ডতার প্রভাব পড়েছে। এ-প্রসঙ্গে অজিতকুমার ঘোষের অভিমত প্রণিধানযোগ্য—" *জমীদার দর্পণ* বাস্তবের অবিকল চিত্র হওয়া সত্ত্বেও চরিত্র বিস্তৃতি ও শৈল্পিক উপাদানের যথার্থ প্রয়োগের অভাবে নাটকটি নক্শাধর্মী হইয়া পড়িয়াছে মাত্র, রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।"[৬]

৩.

সূচনাসূত্রেই বলা হয়েছে, জমীদার দর্পণ নাটকে মশাররফ হোসেন একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘটনাধারা নির্মাণ করেছেন। নাট্যকারের একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের বাহন বলে আলোচ্য নাটকে কোন চরিত্রই

---

৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমিকা, *মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ*, কলকাতা : রত্নাবলী, ১৯৭৮, পৃ. আঠার

৬. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স, ১৯৭৬ (ষষ্ঠ সং.), পৃ. ১৪৯

যথাযথভাবে বিকাশলাভ করেনি। অধিকাংশ চরিত্রই নাট্যকারের ইচ্ছাপূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত, ছককাটা, সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালন করেই দৃশ্যপট থেকে তারা অন্তর্হিত। ফলে অধিকাংশ চরিত্র বিশেষ 'টাইপে' পর্যবসিত। অথচ জমীদার দর্পণ নাটকে মৌল ঘটনাংশ হিসেবে যে বিষয় নির্বাচিত, তাতে একগুচ্ছ সার্থক নাট্যচরিত্র সৃষ্টি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। মশাররফ হোসেনের শিল্পচেতনার পরাভব এই যে, একটি নাট্যোপযোগী বিষয় নির্বাচন করেও যথাযথ পরিচর্যার অভাবে তিনি তা শিল্পের পরম সিদ্ধিতে রূপান্তরিত করতে পারেন নি। এ-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য -

> *জমীদার দর্পণ* আগাগোড়া ঋণাত্মক ও ক্লেদাক্ত মানুষরূপী জীবজন্তুর আচরণে পরিপূর্ণ। প্রথম অঙ্কে ধর্ষণের পরিকল্পনা, দ্বিতীয় অঙ্কে ধর্ষণের অনুষ্ঠান, তৃতীয় অঙ্কে অনুষ্ঠিত কর্মের পুনরালোচনা—এই হোলো 'জমীদার দর্পণে' বিম্বিত জীবনের সরলতম সার। এর বিরুদ্ধে দুর্বল আবু মোল্লা ও দুর্বলতর নূরন্নাহারের প্রতিবাদ এবং প্রস্তাবনা ও উপসংহারের নট-নটীর হিতোপদেশ, সমাজ-সংস্কারমূলক বিদ্রূপাত্মক রচনায় প্রত্যাশিত শুভশক্তির প্রচ্ছন্ন আবাহনকে আদৌ ইঙ্গিতময় করে তুলতে পারেনি। এই দর্পণে এক বিশেষ প্রকৃতির বর্বরোচিত অত্যাচারের কদর্যতা হয়ত অবিকল প্রতিবর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তার শিল্পসঙ্গত রূপান্তর সাধিত হয় নি।[৭]

জমিদার দর্পণ নাটকের চরিত্রসমূহকে আমরা দু'ভাগে বিন্যস্ত করতে পারি। শোষক আর শোষিত, অত্যাচারী আর অত্যাচারিত—নাটকের চরিত্রসমূহ কোন না কোন সূত্রে এই দুই পক্ষের মধ্যে অবস্থান করছে। জমিদার হায়ওয়ান আলী আর তার সহচররা শোষকশ্রেণীর প্রতিনিধি, পক্ষান্তরে আবু মোল্লা, নূরন্নাহার প্রমুখ শোষিতশ্রেণী। এই দুই বিপরীতশ্রেণীর পরস্পর দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে নাট্যচরিত্রসমূহ স্ব স্ব অবয়ব লাভ করেছে। তবে, পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত যথাযথভাবে সংঘটিত না হবার ফলে কোন চরিত্রই প্রত্যাশিত পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। যারা শোষক ও অত্যাচারী, তারা শেষ পর্যন্ত তাই থেকে যায়, কোন ধরনের রূপান্তর কি পরিবর্তন তাদের মাঝে দেখা যায় না। একই কথা শোষিত তথা দুর্বল প্রজাদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ নাটকের সবগুলো চরিত্র প্রথম

---

৭. মুনীর চৌধুরী, *মীর-মানস*, মুনীর চৌধুরীর রচনাবলী ৩য় খণ্ড (সম্পাদক : আনিসুজ্জামান), ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৭

থেকে শেষ পর্যন্ত একই মানসিকতার প্রতিনিধিত্ব করেছে, পরিবর্তন কি বিকাশের কোন স্বাক্ষর তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত। চরিত্রায়ণে এতসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মশাররফ হোসেনের সৃজন-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় হায়ওয়ান আলী ও নূরন্নাহার চরিত্রে। সাধারণ প্রজাদের মধ্যে জীতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী, কৃষ্ণমণি এবং গ্রাম্য-চাষার কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কোশলপুরের জমিদার হায়ওয়ান আলী আলোচ্য নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। নামের মধ্যেই হায়ওয়ান আলীর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য সুপ্রকাশিত। 'হায়ওয়ান' শব্দের অর্থ হলো 'পশু' বা 'জানোয়ার'। লম্পট হায়ওয়ান আলীও পশু বা জানোয়ারের একটি মনুষ্য-সংস্করণ মাত্র। নৈতিকতাবর্জিত নারীলোলুপ অত্যাচারী এক শোষকের নাম হায়ওয়ান আলী, যে-কোন নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অমানবিক কাজ করা তার পক্ষে সম্ভব। বাংলাদেশে সামন্ত-ব্যবস্থার সকল বিষফল আর পঙ্কিলতা অঙ্গে ধারণ করেই যেন আলোচ্য নাটকে হায়ওয়ান আলীর অবস্থান। তাকে দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারি, উনিশ শতকে বাংলাদেশের জমিদারশ্রেণী প্রজাসাধারণের উপর কতটা নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে অত্যাচারী জমিদার হায়ওয়ান আলীর নিষ্ঠুরতা ও মানবিকতার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। যেমন -

ক. জামাল। দেখুন আমরা চাকর, হুকুম কল্লেআর অদুল কত্তে পারিনে। এ কাজটা বড়ই অন্যায় হোচ্ছে! মোল্লার স্ত্রী গর্ভবতী, তারপর এই জাবরান। এ কাজটা বড় অন্যায় হচ্ছে! কি করি? এর অধীনে থেকে একেবারে সর্ব্বনাশ হবে! এর তো দিগ-বিদিগ জ্ঞান কিছুই নাই, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক একটা করে বসেন, যে ভাব দেখতে পাচ্ছি, এতে আমাদের জাতকুল থাকাই ভার! আজ আবৃ মোল্লার যে দশা হলো, কোনদিন বা আমাদের ওরূপ ঘটে।

(দ্বিতীয় অঙ্ক ॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

খ. মোক্তার। মফস্বলের প্রজার হর্ত্তা কর্ত্তা মালিক জমীদার তাদের আদালত ফোজদারীতেই নিষ্পত্য করিয়া থাকে প্রজার পরস্পর বিবাদ নিষ্পত্য হক বা না হক আপন নজরের টাকা হলেই হলো। প্রজারা শাসন ভয়ে মুখে কথা নাই। জমীদার যা বলেন কোন

মতেই তার অবাধ্যি হইতে পারে না। জমীদারের অজানিতে কোন মতেই প্রজা বিচারের প্রার্থনায় আদালত আশ্রয় করিলে তখন জমীদার একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া তার ভিটেমাটি একেবারে জ্বালিয়ে ছারখার করিয়া দেন।

(তৃতীয় অঙ্ক॥ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

গ. আবু। আমার সর্ব্বনাশ তো হয়েইছে—হায়ওয়ান আলী মোকদ্দমায় জিতে আমার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে চুরে মানে ওয়ারন করে ফেলেছে। আমাদের আর দাঁড়াবার লক্ষ্য নাই। (ক্রন্দন) হায় হায়! আমার ধনমান প্রাণ সকলই গেলো, বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল সকলই লুটে নিয়েছে। আমায় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—আমার অন্নবস্ত্র কিছুই নাই!

(উপসংহার)

—উপর্যুক্ত প্রতিটি সংলাপেই হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারী রূপটি সুপ্রকাশিত। অন্য চরিত্রের সংলাপ নয়, হায়ওয়ান আলী নিজের চারিত্র্যস্বভাব নিজেই তুলে ধরেছে -

> "কি? তার স্বামীকে এনে কান মলা নাক মলা দিচ্ছি, খাড়া করে রেখেছি আর তার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মেয়েমানুষের এত হেম্মত! হাকিম দেখায় আমাকে! তবে এর প্রতিফল এখনই দিচ্ছি! ... দেউড়িতে যত সর্দ্দার আছে সব যাও। মোল্লাকে জরুকো পাকাড় লাও। মোল্লার ছেড়ে দাও। আমি মোল্লা চাইনে, নূরন্নাহার চাই (দ্বিতীয় অঙ্ক॥ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)।"

লাম্পট্য এবং বিকৃত দেহজ-কামনা হায়ওয়ান আলীকে অমানুষের পর্যায়ে নিয়ে গেছে। তার লাম্পট্যের শিকার হয়েছে বহু নারী, আবু মোল্লার স্ত্রী নূরন্নাহার তার সর্বশেষ শিকার। তার নিষ্ঠুরতা এবং হৃদয়হীনতা যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কল্পনাও করা যায় না। তাই অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ নূরন্নাহারের উপর নির্মম অত্যাচারে সে কুণ্ঠিত হয় নি। সবশেষে তার অত্যাচারেই নূরন্নাহারের মৃত্যু ঘটে। এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যুও তার কুরুচি আর কুবাসনাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি—তার মধ্যে জাগ্রত হয়নি বিন্দুমাত্র অনুশোচনাবোধ—"ওহে, যথার্থ মলো! (নিকটে যাইয়া নাসিকায় হস্ত দিয়া) নিশ্বাস নাই। মরেছে, না ঐ যে তলপেট নড়ছে? কই আর যে নড়ে না। বুঝি

পেটেরটাও মলো (দ্বিতীয় অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।" আমিরন এবং মোক্তারের সংলাপেও হায়ওয়ান আলীর চারিত্রিক অধঃপতনের সংবাদ পাওয়া যায়। যেমন—

ক. আমিরন ! এমন ! তা হবেই তো ; ওরা ছাগলের জাত! — পর্যন্ত পার পায় না! তুমি আমিতো ছার কথা! বলতেও লজ্জা করে বোন ; শুনতেও লজ্জা! ওদের মেয়েমানুষ দেখলেই চোখ টাটায়, জমিদার হোলেই প্রায় এক খুরে মাথা মুড়নো। ... চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, মুখের চামড়া ঢিল হয়েছে, কিন্তু সক এমনি দাঁত পড়া বাঘের মতন এখনও জিভ্ লক্‌লক্ করে। সেই বাজারে মেয়েগুলো এসে কত লাঞ্ছনা দিয়ে যায়, তবু লজ্জা নাই! কিছুদিন খাবার পরবার নোভে থেকে বেশ দশ টাকা হাত করে মুখে চুনকালী দিয়ে চলে যায়, আবার বেদিনী, যুগিনী, চাড়াল্‌নী, কলুনী—চারজাতের চারজনকে নিয়ে কেউ কেউ বুড়ো বয়সে রঙ্গ কোরছেন, কেউ ঘরের বাইরে রঙ্গিনী নে উন্মত্ত ; কেউ ঘরের দিব্বি স্ত্রী ফেলে পাড়াতেই কাল কাটাচ্ছেন! তা বোন এদেশের জমিদারদের অনেকের দশাই তো এই!

(দ্বিতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

খ. মোক্তার। ... হায়ওয়ান আলী যে চরিত্রের লোক তার প্রমাণ এই দেখুন- ... ইতিপূর্বে সাহেবজাদা হাকিমের আমলে এক হিন্দু স্ত্রীকে জাবরানে ধরে এনে সতীত্ব হরণ করেন। ঐ প্রকার কত কুলবালার সতীত্ব নাশ করেছেন, ধ্বংস করেছেন, নষ্ট করেছেন, মাথা খেয়েছেন, জাতপাত করেছেন যে আমি বল্‌তে চাইনে। ধর্মাবতার, ওদের নিষ্ঠুরতার বিষয় কত প্রমাণ আছে। প্রধান প্রধান হাকিমের রায়েতে প্রকাশ আছে।

(তৃতীয় অঙ্ক॥ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

— উপরের উদ্ধৃতিদ্বয় থেকে হায়ওয়ান আলীর নারী-লোলুপতা এবং লাম্পট্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

হায়ওয়ান আলী তার সমস্ত অপকর্ম খুবই ধূর্ততা এবং চাতুর্যের সঙ্গে সমাধা করে। অপকর্ম বা পাপকাজের জন্য তার মধ্যে কখনো অনুশোচনা কি

পাপবোধ জাগ্রত হয় না। নিষ্ঠুর মানসিকতা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে পাশবিক অত্যাচারে অন্তঃসত্ত্বা নূরন্নাহারের মৃত্যু হলেও সে বিচলিত কিংবা বিমূঢ় হয়নি, বরং ঘটনা চাপা দেওয়ার জন্য অপকৌশল অবলম্বনের চেষ্টা করেছে। কার্যসিদ্ধির জন্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গকে অর্থ দিয়ে সে বশে রাখতো। এইসব ধূর্ততা, চাতুর্য ও অপকৌশল অবলম্বন করে হায়ওয়ান আলী একের পর এক অপরাধ করেছে এবং নূরন্নাহার হত্যাকাণ্ডসহ সব অভিযোগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে।

হায়ওয়ান আলীর অত্যাচারে প্রজাদের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ। বিনা অপরাধে প্রজাদের ধরে এনে অত্যাচার করা, জরিমানা আদায় করা, বন্দী করে রাখা - এসব ছিলো হায়ওয়ান আলীর কাছে অতি সাধারণ বিষয়। পেয়াদা দিয়ে আবু মোল্লাকে ধরে আনার পর সে সহজেই বলতে পারে -

> "আরে আবু! তুই জানিস আমি তোর সব কর্ত্তে পারি? তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাতে পারি? .... তুই ভেবেছিস কি? আমি তোকে সোজা কর্ব্বই কোর্ব্ব! কাবার পঞ্চাশ - জামাল! হারামজাদাসে পঁচাশ-রোপেয়া জরবানা আদা কর! ... হারামজাদা! আমি তোর ঘর বেচবো। তুই যেখান থেকে পারিস টাকা এনে দে। (সর্দ্দারগণের প্রতি) আরে তোরা এখনও ওর মাথায় ইট দিলিনি (প্রথম অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।"

বাইরে প্রচণ্ড দাপট দেখালেও ভিতরে-ভিতরে হায়ওয়ান আলী ছিল দুর্বল প্রকৃতির মানুষ। জমিদারের দুর্বলতা বা ভীতি ধরা পড়েছে আইন বা বিচারব্যবস্থা প্রসঙ্গে তার মনোভাব থেকে। জমিদারতন্ত্রের অবসানের যুগে হায়ওয়ান আলীর অন্তঃস্থ দুর্বলতা ও বিপন্নতা তার নিম্নোক্ত সংলাপে সুপ্রকাশিত —

> ওহে, আমাদের তেজ না আছে এম নয়, আমরা যে কিছুনা কর্ত্তে পারি তাও নয়, তবে সে এক কাল ছিল, এখন ইংরেজী আইন, বিষদাঁত ভাঙ্গা! ... আগে আগে আমরা মফস্বলে কত কি করেছি, কার সাধ্য যে মাথা তুলে একটা কথা বলে? এখন পায় পায় জেলা, পায় পায় মহকুমা, কোণের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে, হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমন-ল'র মার-প্যাঁচ বোঝে।
>
> (প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

জমীদার দর্পণ নাটকে একমাত্র হায়ওয়ান আলীকেই রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয়। সে পূর্ণ-বিকশিত চরিত্র না হলেও, নাটকে তার স্বকীয়তা সুপ্রকাশিত। মানবিক মূল্যচেতনার কোন স্পর্শই তার চরিত্রে লাগেনি। বিবেকবর্জিত মানবিক-বোধশূন্য অত্যাচারী লম্পট চরিত্র হিসেবে পাঠকচিত্তে একটি স্থায়ী আসন সে অধিকার করে নিয়েছে।

আবু মোল্লা আলোচ্য নাটকে একজন অসহায় দরিদ্র প্রজা। জমিদার হায়ওয়ান আলী তার উপর নির্মম অত্যাচার করেছে, ভেঙে দিয়েছে তার সুখের সংসার। অসহায় দরিদ্র প্রজা বলে জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস করে সে কিছু বলতে পারেনি, তার স্ত্রীর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে হতে পারেনি মুখর। অসহায়ের মতো, নিষ্ক্রিয় মানুষের মতো অদৃষ্টের কাছে আত্মসমর্পণের কারণে প্রবল নাট্যিক সম্ভাবনা সত্ত্বেও সে পূর্ণ-বিকশিত কোন চরিত্র হতে পারেনি। হতে পারেনি দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ-এর আরেক তোরাপ। ক্রন্দন আর করুণা দিয়ে সে কেবল পাঠকচিত্তের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করেছে- সংগ্রামে সাহসে দ্রোহে বিদ্রোহে সক্রিয় কোন চরিত্রে উন্নীত হতে পারেনি। আবু মোল্লার সংলাপেই ধরা পড়েছে তার এই অসহায় নিষ্ক্রিয় দুর্বলচিত্ত চারিত্র্যস্বভাব-

> আমিতো কোন অপরাধ করিনি ; তবে জুলুম কেন? ... সকলই আমার নসিবের দোষ, আমি কোন কথার মধ্যে যাইনে, কোন হের-ফের বুঝিনে, .. কেউ চড়া কথা বল্লে কি দু'ঘা মাল্লেও পিঠে সই। দোষ কল্লেই সাজা হয়, তবে যখন সাচ্চা আছি—তখন-সকলি নসিবের— ... একালে যে যত সোজা থাকে তার পাছে কাঠি দিতে কেউ রেয়াত করে না। ... এ আল্লা, তুই জানিস, আমি কোন মন্দ করিনি, হাকিমেরই বা কি করেছি যে হক-না হক মাচ্ছেন? মাটির হাকিমের কুনজরে পলে কি আর বাঁচা যায়?
>
> (প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

নাটকের অপ্রধান চরিত্রাবলি প্রত্যেকেই একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। জীতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী, জামাল, সিরাজ আলী প্রভৃতি চরিত্র কোন-না-কোন ভাবে জমিদার হায়ওয়ান আলীর পক্ষে কাজ করেছে। জীতু মোল্লা ও হরিদাস বৈরাগী ভণ্ড ধার্মিক। ধর্মের নাম করে অবলীলায় তারা মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করেছে, এজন্য তারা বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয়নি। নাটকের বিচার-দৃশ্যে সামান্য সময় উপস্থিত

থাকলেও কপটতা, মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি দিয়ে সে পাঠক-দর্শক চিত্তে গভীর দাগ কেটে যায়। চারবার হজ্বব্রত পালনকারী 'ধর্মপ্রাণ' জীতু মোল্লা নিজেকে একজন পরহেজগার মানুষ হিসেবে পরিচয় দিলেও, আদালতে হায়ওয়ান আলীর পক্ষে সে অবলীলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। ব্যারিস্টার ও জীতু মোল্লার নিম্নোক্ত সংলাপ থেকে ভণ্ড মিথ্যাবাদী কপট জীতুকে সহজেই চেনা যাবে —

ব্যারিস্টার!	হায়ওয়ান আলী কেমন লোক আছে?—
জীতু।	(তসবি ছুঁইয়া কপাল চুলকাইয়া মাথা নাড়িয়া) আহা অমন লোক দুনিয়া জাহানে আর নাই! বড় দীনদার, বড় দাতা ; মক্কায় যাইবার সময় হামারে পঞ্চাশটি টাহা দেয়।
ব্যারিস্টার ।	হায়ওয়ান আলী নূরন্নাহারকে মারিয়াছে?
জীতু ।	(দুই গালে হাদ দিয়া) তোবা তোবা তোবা! সে কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে, তা কহনো হবার নয়।

(তৃতীয় অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

জীতু মোল্লার মতোই ভণ্ড ও কপট চরিত্র হরিদাস বৈরাগী। কপালে তিলক-ফোঁটা, হস্তে-গলে তুলসীর মালা, কণ্ঠে কুড়জালি আর গায়ে নামাবলি রেখেই ধর্ম-ব্যবসায়ী হরিদাস বৈরাগী আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে, স্বার্থের জন্য হত্যাকারী হায়ওয়ান আলীর পক্ষে উচ্চারণ করেছে নিম্নোক্ত সংলাপ —

> বড় ভাল মানুষ। আর সেই জমীদার বড়লোক বড় ধার্মিক, গরীব লোকের প্রতি ভারী দয়া! আর বৈষ্ণবী যখন খাঁ সাহেবের বাড়ীতে যান তিনি কাপড় টাকা পয়সা চাল দয়া করে দিয়ে থাকেন।

(তৃতীয় অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

সিরাজ আলী এবং জামালও জমিদারের পক্ষে কাজ করেছে। অসৎ কর্মের জন্য অনুজ হায়ওয়ান আলীকে তিরস্কার করলেও, তাকে রক্ষা করার কৌশল বাতলে দেওয়ার মধ্যেই সিরাজ আলীর আসল পরিচয় অনুধাবন করা যায়। জামাল প্রজাপীড়ক অসৎ চরিত্র। তবু কখনো কখনো তার মধ্যে আমরা বিবেকের দংশন লক্ষ করি। এই বিবেক-বোধ থেকেই জমিদার হায়ওয়ান আলীর সব কাজ সে মেনে নিতে পারেনি, পালন করেনি তার সব নির্দেশ।

অন্তঃসত্ত্বা নূরন্নাহারকে অপহরণের পর তার উক্তির মধ্যে এই ঔচিত্য-দংশনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পুরুষ-চরিত্রের মতো নারী চরিত্রসমূহও যথাযথ বিকাশ লাভ করতে পারেনি আলোচ্য নাটকে। নূরন্নাহার, আমিরন, কৃষ্ণমণি—কেউই অস্তিত্বধারী সত্তাময় ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে পারেনি। এই ত্রয়ী চরিত্রের মধ্যে নূরন্নাহারের নাট্য-সম্ভাবনা ছিল সীমাহীন। যথাযথ বিকশিত না হলেও, চরিত্র হিসেবে সে সীমিত স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পেরেছে। সতীত্ব রক্ষার আপ্রাণ সংগ্রাম, স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম, নিষ্ঠুর জমিদারের বিরুদ্ধে ঘৃণা, প্রলোভনমুক্ত নির্লোভ স্বভাব, মানসিক দৃঢ়তা—এইসব বৈশিষ্ট্য নূরন্নাহারকে উজ্জ্বল চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। প্রলোভন বা ভয়ের কাছে সে কখনো পরাজিত হয় নি। হায়ওয়ান আলীর মতো জঘন্য-চরিত্রের জমিদারের মুখ দিয়েও বেরিয়ে এসেছে নূরন্নাহার সম্পর্কে এই প্রশংসা— "তোমরা বোধকর সামান্য, কিন্তু আমি বেড়িয়ে বেড়িয়ে দেখেছি, স্বভাব চরিত্র যতদূর জেনেছি, তাতে বোধ হয় সেটি অসামান্য! .. টাকাব লোভ দেখিয়েছি, কত গওনার লোভ দেখিয়েছি, কিছুতেই ভোলে না (প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)।" জমিদারের দূতী কৃষ্ণমণির প্রলোভন-প্রস্তাবও নূরন্নাহার দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছে—

> আমি বৈঠকখানায় যাবো মাসি? ... এতকাল পরে তুমি আমায় এই কথা বল্লে? তাঁর কি এমন কৰ্ম্ম করা উচিত? অধীনে আছি বলেই কি এমন অধর্মের কাজ কর্ব্বেন? এই কি তার ধৰ্ম্ম?- এ বড় দারুণ কথা, আমা হোতে এমন কৰ্ম্ম হবে না! তিনি যা করুন, তা করুন, প্রাণ থাকতে আমা হোতে এমন কুকাজ হবে না- আমি বৈঠকখানায় কখনও যেতে পারবো না। যদি বড় পেড়াপীড়ি হয় তবে এই রাত্রেই গলায় দড়ি দিয়ে ম'র্ব্বো!
>
> (দ্বিতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

লম্পট হায়ওয়ান আলীর হিংস্র থাবা থেকে নূরন্নাহার যখন নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি, তখন সে আত্মগ্লানিতে নিমজ্জিত হয়েছে, দেশজুড়ে কলঙ্ক রটার ভয়ে হয়েছে শঙ্কিত। সকল বিপদের মুখেও স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা ছিল সদা জাগ্রত। তাই নিজের সমূহ বিপদের কথা ভুলে সে স্বামীর জন্য অজানা আশঙ্কায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে—"... রাত্রে যে তাঁকে কত কষ্ট দেবে, কত মারই মারবে, কত বারই যে খাড়া করবে, আমার সেই কথাই

মনে পড়ছে। তাঁর হাতে একটি পয়সাও নেই...। টাকার জন্য তাকে মেরে মেরে একেবারে খুন করে ফেল্‌বে (দ্বিতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)।" নূরন্নাহার প্রতিবাদী চরিত্র না হলেও, কখনো কখনো তার সংলাপে উদ্ভাসিত হয়েছে প্রতিবাদের উষ্ণতা। তাই জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষ্ণমণির কাছে সে উচ্চারণ করেছে এই সাহসী বক্তব্য—

> দুর্জ্জনকে সকলেই ভয় করে। এই কি তাঁর বিবেচনা? ... দেখ দেখি বাছা এ তাঁর কেমন বিচার? হাকিমে এমন করে বিচারে মাল্লে আর কার কাছে দাঁড়াবে? এপর যদি হাকিমের পর হাকিম থাকতো, তবে এর বিচের হোতো!
>
> (দ্বিতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

নূরন্নাহার রক্ত-মাংসে গড়া আমাদের পরিচিত ভুবনের এক সহজ সরল সাধারণ নারী। মশাররফ হোসেন পরিচর্যা-কৌশলে আধুনিক নাট্যরীতি অবলম্বন করতে পারলে নূরন্নাহার প্রকৃত অর্থেই হতে পারতো বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্মরণীয় এক ট্র্যাজিক-চরিত্র।

কৃষ্ণমণি এক অসৎ চরিত্র ; অর্থলোলুপতা, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার, শঠতা ও নৈতিকতা-বহির্ভূত কর্ম দ্বারা সে হয়ে উঠেছে এক আকর্ষণীয় চরিত্র। মধ্যযুগের 'কুটনী' চরিত্রের আদর্শে রচিত কৃষ্ণমণি জমিদার হায়ওয়ান আলীর কুকর্মের অন্যতম সহায়তাকারী। পক্ষান্তরে আবু মোল্লার বোন আমিরন একটি সদর্থক চরিত্র। সাহস, সততা, বুদ্ধিমত্তা, সহানুভূতিশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তার চরিত্রে বিদ্যমান। নারীলোলুপ অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধে সে নানা সময় সাহসী প্রতিবাদ উচ্চারণ করেছে, জমিদারকে সর্বভুক 'ছাগলের জাত' বলতেও ভীত হয়নি।

জমীদার দর্পণ নাটকের অপ্রধান চরিত্রসমূহ স্বল্প-পরিসরে হলেও নিজ নিজ ভূমিকা নৈপুণ্যের সঙ্গে পালন করেছে। নট, সূত্রধর, মোসাহেববৃন্দ, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ইন্‌সপেক্টর, মোক্তার, চাষা প্রভৃতি চরিত্র স্বল্প-পরিসরেই আপন বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। পরিধির সংক্ষিপ্তির কারণে এরা কেউ-ই পূর্ণরূপে বিকাশের সুযোগ পায়নি ; তবু নাটকের পরিণতি-সংঘটনে তারা যে ভূমিকা পালন করেছে, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৪.

জমীদার দর্পণ নাটকের ভাষা ও সংলাপ মীর মশাররফ হোসেনের প্রাতিস্বিক শিল্পচেতনার পরিচয়বাহী। *বঙ্গদর্শন* পত্রিকায় জমীদার দর্পণ নাটক সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ভাষার প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন- "জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্ত্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানী বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা, এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।"[৮] জমীদার দর্পণ নাটকে মশাররফ হোসেন চরিত্রের শ্রেণী-অবস্থান অনুযায়ী ভাষা ব্যবহারের প্রয়াস পেয়েছেন। ফলে ভাষা ও সংলাপ হতে পেরেছে জীবন্ত ও সজীব ও বিশ্বাসযোগ্য।

জমীদার দর্পণ নাটকে ব্যবহৃত হয়েছে কথ্য ভাষাভঙ্গি। বিচার দৃশ্যের সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া কথ্য ভাষারীতি নাটকটির কেন্দ্রীয় বিষয়াংশ-উন্মোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। "জমীদার দর্পণ নাটকে চরিত্রের শ্রেণী-অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও মানস-প্রবণতা প্রতিফলনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাষাভঙ্গি ও রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের ত্রিবিধ ভাষাগত শ্রেণীকরণ সম্ভব : ক. উচ্চ অভিজাত ও সহযোগী মধ্যশ্রেণী, খ. নিম্নশ্রেণীর গ্রামীণ রায়ত-প্রজা, পাইক-বরকন্দাজ, গ. ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট।"[৯]

উচ্চ অভিজাত ও সহযোগী মধ্যশ্রেণীতে আছে জমিদার হায়ওয়ান আলী, মোসাহেববৃন্দ, সিরাজ আলী, নট-নটী, উকিল-মোক্তার প্রভৃতি চরিত্র। এইসব চরিত্রের সংলাপে মাঝে মাঝে সংস্কৃত শব্দ এবং সাধু-রীতির স্পর্শ লাগলেও আন্তর-বৈশিষ্ট্য তা কথ্য গদ্যরীতির কাঠামোতেই নির্মিত। এইসব চরিত্রের মুখের ভাষা বিশুদ্ধ ও মার্জিত এবং আভিজাত্য-নির্দেশক।

যেমন —

ক. জমিদার হায়ওয়ান আলীর সংলাপ —

> আবু মোল্লা নব কার্ত্তিক! বিধির নির্বন্ধ দেখ চাষার হাতে গোলাপ ফুল, একি প্রাণে সয়?

(প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

---

৮. উদ্ধৃত : মুহম্মদ আবদুল কাইউম, *রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা : সমকালের দর্পণে*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯১, পৃ. ১৩৮

৯. আবুল আহসান চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯৬

খ. নট-এর সংলাপ —

> কেন, এ আপনার নিতান্ত ভুল। রাজার নিকট সবল দুর্ব্বল, ছোট বড়, ধনী নির্ধনী, সুখী দুঃখী, সকলি সমান! সকলি সম স্নেহের পাত্র। সকলের প্রতিই সমান দয়া!

(প্রথম অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

গ. দ্বিতীয় মোসাহেবের সংলাপ —

> আপনি তাকে যথার্থ ভালবেসে থাকেন, সেও ভালবাসবে ; এতো চিরকালই আছে, মনে মনে যে যাকে ভালবাসে সেও তাকে ভালবাসে।

(প্রথম অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

তৎকালীন রীতি এবং আভিজাত্যের প্রকাশ হিসেবে জমিদার হায়ওয়ান আলী মাঝে-মধ্যে আরবি-ফারসি-উর্দু মিশিয়ে এক মিশ্র ভাষায় সংলাপ উচ্চারণ করেছে। এই ধরনের সংলাপ তার আভিজাত্য প্রকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। যেমন— "চুপরাও হারামজাদা! আব্তাক্ হামরা সামনে মুখোন্কে বাৎ কাহতা হায়! আভি লে যাও! লে যাও! ... ঘণ্টে কা দারমিয়ান রোপেয়া আদা কর (প্রথম অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।" কেবল হায়ওয়ান আলী নয়, পেয়াদা, কনস্টেবল, ইন্সপেক্টর প্রভৃতি চরিত্রও আরবি-ফারসি-উর্দু মিশ্রিত এরূপ মিশ্র ভাষায় সংলাপ উচ্চারণ করেছে।

নাটকে ভাষাগত দৃষ্টিকোণে যারা দ্বিতীয় স্তরে আছে, তারা মূলত রায়ত-প্রজা ও নিম্নশ্রেণীর মানুষ। এই দলে আছে আবু মোল্লা, নূরন্নাহার, আমিরন, জীতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী, কৃষ্ণমণি, চাষা প্রভৃতি চরিত্র। নিম্নশ্রেণীর এইসব মানুষের মুখের ভাষা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়বাহী। এদের ভাষা সহজ, সরল, কৃত্রিমতাবর্জিত, অমার্জিত ও অশুদ্ধ ; গ্রাম্যতাদোষ এদের সবারই সাধারণ লক্ষণ। গ্রামীণ জীবনের প্রাত্যহিকতার উত্তাপে ঋদ্ধ এদের ভাষা। এ প্রসঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত আমিরনের উক্তি স্মরণ করা যায়।

আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহারেও আলোচ্য নাটকে মীর মশাররফ হোসেন বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। জীতু মোল্লা, হরিদাস বৈরাগী ও চাষাদ্বয়ের মুখে আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করে নাট্যকাহিনীকে বাস্তবতার সীমায় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। এদের ভাষার আঞ্চলিক শব্দ ও বাক্যবন্ধ

নাট্যকাহিনীতে এক ধরনের কৌতুক রসও সৃষ্টি করেছে। আরবি-ফারসি-উর্দু ভাষা মিশ্রিত জীতু মোল্লার সংলাপ এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—"হুজুর আমি আবু মোল্লার কুটুম। যেদিন এই মামলার বাত কতেছে আমি সেদিন আবু মোল্লার খান্‌কা ঘরে বসে সারা রাত আল্লা আল্লা করে জেহীর করেছি ; নামাজ পড়েছি। আমি রাত্রে ঘুম পাড়িনা। ... জানবোনা ক্যা? আবুই মারতে মারতে এহেবারে খুন করেছে (তৃতীয় অঙ্ক॥ তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)।" দুই চাষার সংলাপেও আঞ্চলিক ভাষার নিপুণ প্রয়োগ আমরা লক্ষ করি। চাষাদ্বয়ের কথোপকথনে গ্রামীণ পরিবেশের যেমন বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি ধরা পড়েছে তাদের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য। যেমন —

প্রথম চাষা ।	এ গাঁয়ে আর বস্তিচ্চি হয় না। গেল না' ওরে ধরে নিয়ে এই কাণ্ডটা করেছে। — জমীদার বহুত আছে, অনেক জমীদারের নাম ত শুনেছি। এরা যেমন বাবা!
দ্বিতীয় চাষা ।	মামুজি, কি নকমে মাল্লে?
প্রথম চাষা ।	আমি কি দেখতে গেছি?
দ্বিতীয় চাষা ।	বুঝিছি, বুঝিছি ও ব্যাটা বড় শয়তান। বন্দুক হাতে করে ঠিক সাঁজের বেলা আমাদের বাড়ীর পাছ কানাচে ঘুরে বেড়ায়, ঘুরেই বেড়ায়! পাছ দুয়র দিয়ে বাড়ীত যদিও আসে, বেটার চালচলন বড় খারাপ। মামুজি তুমি শোননি, ঐ সেই দহিন পাড়ার জেলা বড় হ্যাকমত করে বলে হ্যাল।

(তৃতীয় অঙ্ক॥ প্রথম গর্ভাঙ্ক)

ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে ভাঙা-ভাঙা উর্দু-হিন্দি-ইংরেজি মিশ্রিত এক ধরনের মিশ্রভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। এই মিশ্রভাষা ব্যবহারের ফলে তাদের চরিত্রের মৌল বৈশিষ্ট্য যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি নাট্যস্রোতে সঞ্চারিত হয়েছে কৌতুক-রস। যেমন ম্যাজিস্ট্রেটের সংলাপ — "নেই, সবুদা হুয়া, ... টোমরা কুছ ছওয়াল হ্যায় ? ... ও হটে পারে না, টুমি আসামীর পক্ষে আছে, টোমার বক্তটা শেষে হতে পারে।"

(তৃতীয় অঙ্ক॥ দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

মশাররফ হোসেন জমীদার দর্পণ নাটকে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মুখে প্রচুর পরিমাণে উপভাষা প্রয়োগ করেছেন। কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অঞ্চলের উপভাষা ব্যবহার করে তিনি চরিত্রসমূহকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পক্ষান্তরে দুই ইংরেজের মধ্যে সংলাপ নির্মাণ করেছেন ইংরেজি বাক্যে। বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য এটাও ছিল জরুরি। প্রবাদ-প্রবচনের নিপুণ প্রয়োগ মশাররফ হোসেনের সাহিত্যের একটি সাধারণ লক্ষণ। আলোচ্য নাটকেও আমরা প্রবাদ-প্রবচনের বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করি। 'চাষার হাতের গোলাপ ফুল', 'পাকা আম দাঁড়কাকে খায়', 'কাকের উপরে কামানের আওয়াজ', 'রাজা বাদী উত্তর না দি' প্রভৃতি প্রবাদ-প্রবচনের কথা এ-প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

৫.

দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ (১৮৬০) নাটক প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্যে 'দর্পণ-নাটক' রচনার একটা প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। নীল-দর্পণ প্রকাশের তের বছর পর প্রকাশিত হয় জমীদার দর্পণ নাটক। নীল দর্পণ নাটক প্রকাশের পরে যে-সব 'দর্পণ নাটক' গ্রন্থকারে মুদ্রিত হয়, তার তালিকাটি এরকম- বাঙালি সমাজের অনাচার নিয়ে লেখা অজ্ঞাতনামা জনৈক লেখকের সাক্ষাৎ দর্পণ (১৮৭১), গ্রামীণ জীবনের দুরবস্থা নিয়ে লেখা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পল্লীগ্রাম দর্পণ (১৮৭৩), জমিদারের অত্যাচার ও শোষণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত জমীদার দর্পণ (১৮৭৩), কেরানি জীবনের বাস্তাব সমস্যা নিয়ে রচিত যোগেশচন্দ্র ঘোষের কেরানী দর্পণ (১৮৭৪), দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায় রচিত কেরানী দর্পণ (১৮৭৫) এবং চা-কর দর্পণ (১৮৭৫)। সন্দেহ নেই, এই দার্পণিক নাট্যধারায় নীল-দর্পণের পর জমীদার দর্পণই শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম।

দীনবন্ধু মিত্রের নীল-দর্পণ নাটকের সঙ্গে মশাররফ হোসেনের জমীদার দর্পণ নাটকের নানা বিষয়েই সাদৃশ্য রয়েছে। কেবল নামকরণ নয়, বিষয়াংশ নির্বাচনে, ঘটনা সংস্থানে, চরিত্র চিত্রণে এবং কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য বিচারেও এই সাদৃশ্যের মাত্রা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। জমীদার দর্পণ-এর উপর নীল-দর্পণ-এর প্রভাব এত বেশি যে মুনীর চৌধুরী 'স্থল বিশেষে সরাসরি অনুসরণ

বলে ভ্রম হয়'[১০]- এরূপ মন্তব্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই প্রথম নীলদর্পণ-এর সঙ্গে জমীদার দর্পণ নাটকের তুলনা করেন। ঘটনাসংস্থান ও চরিত্রচিত্রণে সীমিত সাদৃশ্য থাকলেও আলোচ্য নাটকে মশাররফ হোসেনের স্বকীয়কতাও প্রকাশিত। নীলদর্পণ-এর সঙ্গে জমীদার দর্পণ নাটকের মৌল পার্থক্য হলো—নীলদর্পণ-এ বিদেশী শোষক নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে, আর জমীদার দর্পণ-এ রূপায়িত হয়েছে দেশীয় শোষক জমিদারশ্রেণীর শোষণ আর নির্যাতনের চিত্র।[১১]

৬.

শিল্পী হিসেবে মীর মশাররফ হোসেনের স্বাতন্ত্র্য এই যে, আধুনিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ মুসলিমসমাজ থেকে আবির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকেই তিনি সৃজনশীল সাহিত্যের মানবতাবাদী মৌল ধারাটির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জমীদার দর্পণ নাটকের বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পচারিত্র্য পর্যালোচনা শেষে এ-সত্যই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। কালের দলিল হিসেবে নীল-দর্পণ নাটকের মতো জমীদার দর্পণ নাটকেরও ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের জমিদারি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এমন প্রচণ্ড আঘাত ইতঃপূর্বে অন্য কোন সাহিত্যিকের রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না।[১২] জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারকে একটি বিশেষ সামাজিক বা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল হিসেবে উপলব্ধি করতে না পারলেও,[১৩] তাদের অন্যায়-অত্যাচারের খণ্ডচিত্র উপস্থাপন-সূত্রে বিধৃত হয় মীর মশাররফ হোসেনের বিস্ময়কর সমাজসচেতনতার পরিচয়। কাজেই, একটি বিশেষ কালের নিখুঁত চিত্র হিসেবে জমীদার দর্পণ, শৈল্পিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কালোত্তীর্ণ শিল্পের মর্যাদায় অভিষিক্ত।

---

১০. মুনীর চৌধুরী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

১১. সেলিম জাহাঙ্গীর, *মীর মশাররফ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ১০৮

১২. গীতা মুখোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা*, কলকাতা : কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮১, পৃ. ৭১

১৩. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ২২৭